সংবাদ

তারিখ 18 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ......

শিক্ষা আন্দোলনের ঐতিহাসিকতা ও সমকালীন প্রেক্ষাপট

অরুণ ব্যানার্জী

শিক্ষা ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের পটভূমিকায় গড়ে ওঠে। আদিম যুগে অসভ্য মানুষও অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করত। ভারতবর্ষে আর্য ও দ্রাবিড়দের আমলে উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ছিল। বৈদিক যুগে প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক উন্নত শিক্ষার। রামায়ণ ও মহাভারতের মতো গ্রন্থ উন্নতমানের শিক্ষা প্রচলিত থাকার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বেদ ও উপনিষদ থেকে জানা যায় যে, শিশুর জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময়কে বিদ্যা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল। প্রাচীন বৈদিক যুগে এমন অনেক গুরু ছিলেন যাদের বাড়িতে, ছাত্ররা বাস করতেন। বিভিন্ন গোত্রের, সন্তানদের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধ আমলে মনাস্ট্রিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয় বৌদ্ধ মঠ। এতে ছাত্র-শিক্ষক একত্রে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হতো টোলে। উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় বিহার ও সংঘরাম। নালন্দা, তক্ষশিলা, শালবন ও পাহাড়পুরে এ ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়া হয় মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ ও মঠ এবং ব্যক্তিগত বাড়িতে। উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল থাকাকালে উইলিয়াম এডাম নামে একজন মিশনারি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের ভার গ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাদের ধর্মীয় ভাষার শিক্ষা ব্যবস্থা করতে সরকারকে অনুপ্রাণিত করেন। এছাড়া ১৮৫৪ সালের উলের ডেসপাচ, ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন, ১৯৩৪ সালে সা প্রু কমিটি, ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট কমিশন গ্রহণ করে পরিচালিত হতে থাকে ঔপনিবেশিক পন্থায় শিক্ষা কার্যক্রম।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম হয় পাকিস্তানের। ডিসেম্বর মাসে প্রথম নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর জন্য দেশের সকল অঞ্চলে আইনও করা হয়েছিল। কিন্তু এ প্রস্তাব আদৌ বাস্তবায়ন হয়নি। ১৯৪৯ সালে শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি, ১৯৫২ সালে মওলানা আকরাম খাঁর নামে 'শিক্ষা কমিটি' গঠিত হয়। এদের প্রস্তাবিত শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোর মুখ দেখেনি। ছাত্র-শিক্ষকদের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালের ৩ জানুয়ারি গঠিত হয় পূর্ব-পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন। কমিশনের সুপারিশে বাস্তবভিত্তিক বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়া সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশও উপস্থাপন করে কমিশন। কিন্তু সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর। ভেস্তে যায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের নতুনতর ভাবনা। আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর শিক্ষানীতি প্রণয়নের ঘোষণা দেন। তিনি নিজেই ১৯৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি তার ঘোষিত শিক্ষা কমিশনের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইয়ুব খানের প্রাক্তন শিক্ষক এসএম শরীফকে চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়। এতে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। এর মধ্যে ৬ জন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ও ৪ জন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগ দেয়া হয়। কমিটি ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন হিসেবে কমিশনের সুপারিশ দাখিল করে প্রেসিডেন্টের কাছে। গ্রন্থাকারে তা মুদ্রিত হয় ১৯৬২ সালে। এতে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার সাধারণ বর্ণমালা আরবিতে প্রবর্তন করার সুপারিশ করা হয়। উর্দু ও বাংলা বর্ণমালাসমূহ সংস্কার ও উন্নয়ন করার সুপারিশ যেমন করা হয়েছে, তেমনি রোমান বর্ণমালাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন হওয়া উচিত বলে কমিটি মনে করেন। এতে আরো বলা হয় যে, রোমান বর্ণমালার এমন একটি আকারের উদ্ভব হবে যা পাকিস্তানি ভাষাসমূহকে অক্ষরান্তর করার উপযোগী হবে। শরীফ কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাকে একটি 'অলাভজনক বিনিয়োগ' বলে গণ্য করা হয়। এতে আরো বলা হয় শিল্পে মূলধন বিনিয়োগকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি অনেকটা সেই নজরে শিক্ষা বাবদ অর্থ ব্যয়কে দেখার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হয়। এতে অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে অবাস্তব বলে পরিহাস করা হয়। সুপারিশ করা হয় ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি করার। '**Education is a non-profitable Investment**' মাধ্যমে ধনীদের সন্তানদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। এতে দরিদ্র পিতার সন্তান মেধাবী হলেও শিক্ষার দরজা তার জন্য বিলাসিতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

ছাত্র সমাজ শরীফ কমিশনের প্রতিবেদনকে 'প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি' হিসেবে চিহ্নিত করে। ছাত্র সমাজের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন শুরু হয়েছিল ঢাকা কলেজ থেকে। 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' ব্যানারে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদী হয়। পরে ছাত্র-ছাত্রীরা 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্ট ফোরাম' নামে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আজম কলেজ (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী কলেজ) এবং ইডেন কলেজ ছিল এ আন্দোলনের মূলশক্তি। আন্দোলন বেগবান হয় ১৯৬২ সালের ১০ আগস্ট একটি সমাবেশ থেকে। ওইদিন বিকেলে ঢাকা কলেজ ক্যান্টিনে স্নাতক ও উচ্চ-মাধ্যমিক উভয় শ্রেণীর ছাত্ররা মিলিত হয় সমাবেশে। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক আহমেদ। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দেন শিক্ষার আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরস্পর সম্পর্কযুক্তই নয়, এক সূত্রে গাঁথা। উক্ত সমাবেশে ১১-১৫ আগস্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দেশব্যাপী ছাত্রসমাজের মনে তা ব্যাপক সাড়া জাগায়। ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন সংগ্রামের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় বেশ কয়েকটি ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন ডাকসুর পক্ষে এনায়েতুর রহমান, জামাল আনোয়ার রামু, ঢাকা কলেজের ভিপি ও জিএস যথাক্রমে আব্দুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম ও কাজী ফারুক আহম্মদ, ইডেন কলেজের ভিপি মতিয়া চৌধুরী, কায়েদে আলম কলেজের ভিপি নুরুল আরেফিন খান, নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজের ভিপি আব্দুল আজিজ বাগমার প্রমুখ। ১৭ সেপ্টেম্বর ছাত্র সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি কাজী জাফর আহমদ প্রমুখ ছাত্র নেতা। ওই পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বাবলু, মোস্তফা, ওয়াজি উল্লাহ। শরীফ কমিশন ব্যর্থ হওয়ায় ছাত্র সমাজে এর প্রভাব পড়ে। ছাত্র সমাজ ও জনগণ সামরিক শাসনবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আইয়ুব খান ৬২-এর ছাত্র আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান ও শরীফ কমিশনের মূল্যায়নের জন্য ১৯৬৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর গঠন করেন হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন। এরপর ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব সরকারের পতনের, ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার ১৯৬৯ সালে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান গঠন করেন নূর খাঁ শিক্ষা কমিশন। কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলনের কারণে কোনটাই বাস্তবরূপ লাভ করেনি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয় রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে। স্বাধীন দেশের উপযোগী মানসম্মত শিক্ষার জন্য ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশন। ১৯৭৪ সালের মে মাসে এ কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যার মধ্য দিয়ে এ কমিশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৯৭, ২০০১ ও ২০০৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষার ওপর ৭টি কমিশন গঠন করে শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়। কিন্তু এগুলো বেশিদিন টিকে থাকতে পারে নি। ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন এবং শিক্ষানীতি প্রণয়নে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, আলেম ওলামাসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞানভিত্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণমুখী শিক্ষানীতিই হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর মূলমন্ত্র। এতে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপরেও শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের দাফতরিক কাজে অতিমাত্রায় ব্যস্ততা, শ্রেণিকক্ষে অনুন্নত পাঠদান, কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউশনির লাগাম টেনে ধরার ক্ষেত্রে প্রশাসনের ব্যর্থতা, ম্যানেজিং কমিটির অদক্ষতা ইত্যাদি কারণে ব্যাহত হচ্ছে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম।

শিক্ষার জল সিঞ্চনকারী হচ্ছেন শিক্ষক শিক্ষকদের মধ্যে একটি বড় অংশ হচ্ছেন নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, সরকার যায়, সরকার আসে। কিন্তু এদের দুর্ভোগের প্রহর ঘোচে না। সরকারের নীতিনির্ধারক মহল এদের দেখেন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। এসব শিক্ষক কাজ করেন নিয়মিত। কিন্তু বেতন পান না। তাদের কোনো পারিবারিক কিংবা সামাজিক স্বীকৃতি নেই। এদের জীবনে ঈদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন অথবা বৌদ্ধ পূর্ণিমার আনন্দময় বাণী কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করে না। বরং জীবন যন্ত্রণার কাছে এসব উৎসব হতভাগ্য শিক্ষকদের কাছে বিভীষিকা মনে হয়। নববর্ষে তাদের জীবনে আসে না নতুনতর ব্যঞ্জনা। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস কিংবা শহীদ দিবসে এসব ভাগ্যবঞ্চিত শিক্ষক প্যান্ট-শার্ট বা শাড়ি কিনতে পারেন না। কিংবা তাদের কষ্টার্জিত বেতনের টাকায় এসব শিক্ষক তাদের সন্তান সন্ততি বা প্রিয়জনদের কিছু উপহার দিতে পারেন না। যারা ঘাম, রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে বেসরকারি কলেজ বা বেসরকারি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন কিংবা গাঁটের পয়সা খরচ করে চেয়ার টেবিল বেঞ্চ কিনে এলাকায় শিক্ষার আলোকে সমুজ্জ্বল রেখেছেন তাদের কথা বিবেচনায় আনা হোক। আমরা মনে করি সুরকারের গণমুখী শিক্ষানীতির সঙ্গে ননএমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দুর্দশা আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এভাবে ননএমপিওভুক্ত শিক্ষকরা বছরের পর বছর গাঁটের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবেন তা হয় না। এদের ব্যাপারে সরকারের নীতিনির্ধারক মহল সদয় হবেন এটা আমরা চাই।

সরকারের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটিয়ে যারা গ্রীষ্মের দাবদাহ, বর্ষার ধারা কিংবা শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ দিয়ে জাতি গঠনে নির্মোহ ভূমিকা পালন করে চলেছেন তাদের কর্মপ্রয়াসের মূল্যায়ন হোক। এসব শিক্ষকের এমপিওভুক্তির ব্যবস্থা করে সরকার তাদের পারিবারিক, সামাজিক জীবনে স্বস্তি আনবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। প্রয়োজনবোধে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার অবসান ঘটিয়ে মানুষ গড়ার কারিগর নন এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দুঃসহ অন্ধকার ঘোচাবার ব্যবস্থা নেয়া হোক। মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থার স্ফুরণ ঘটুক আমাদের জাতীয় জীবনে।

[লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট]

পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর